মুফতি আখতার ইমাম আদিল কাসিমি

অমুসলিম দেশে মুসলমান

জীবনযাপন, সমস্যা ও শরয়ি সমাধান

অমুসলিম দেশে মুসলমান

জীবনযাপন, সমস্যা ও শরয়ি সমাধান

মুফতি আখতার ইমাম আদিল কাসিমি

অনুবাদক : আবদুল্লাহ আনওয়ারী

সম্পাদক : আবদুল হক

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৩

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২৪০, US $ 12. UK £ 9

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-97834-4-2

Aumuslim Deshe Musalman
[The Life of Muslims in non-Muslim Countries]
by **Mufti Akhtar Imam Adil Qasimi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantordk
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher. except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

সবচেয়ে বেশি মানুষ বাইরে থাকেন এমন দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম দেশ। বর্তমানে আমাদের প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ ছড়িয়ে রয়েছেন দুনিয়ার নানা দেশে। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো ছাড়াও আমাদের বাংলাদেশি ভাইবোনদের বড় একটি অংশ বাস করছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি অমুসলিম দেশে।

এই যে মুসলিমদের অমুসলিম দেশে যাওয়া, থাকা, থেকে যাওয়া একেবারে নাগরিক হয়ে—ইসলাম একে কীভাবে দেখে? শরিয়তের দৃষ্টিতে এ কি বৈধ, না অবৈধ? প্রশ্ন এখানেই শেষ নয়। জিজ্ঞাসা আছে আরও। হররোজ মিশতে হয় অমুসলিমদের সঙ্গে। খেতে হয় তাদের তৈরি করা খাবার। মেনে চলতে হয় তাদের কিছু আচার। ইসলাম কি এর অনুমতি দেয়? দিলে, তা কোন পর্যন্ত?

ইবাদত-বন্দেগির কোথাও আছে স্বাধীনতা, কোথাও কিছু সীমাবদ্ধতা। নামাজ ঠিক আছে, কিন্তু আজান দেওয়া যাবে না। ঈদ করতে পারবেন, তবে কুরবানি চলবে না। টাকা রাখবেন, তবে সুদ মিশে যাবে। ভোট দিতে পারবেন, তবে অমুসলিমকে—কেননা মুসলিম প্রার্থীই নেই। কিংবা আছে—ছোট দল, আর প্রার্থী সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি; তাই রাজনৈতিক স্বার্থে গড়তে হবে জোট, অমুসলিম বড় দলের সঙ্গে। এসব ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী? কোন কাজ কী শর্তে কতটুকু বৈধ?

কিংবা ধরুন, গির্জা বা মন্দির বানাতে চাঁদা চাইতে এল। দেবেন? আপনার মসজিদ নির্মাণে টাকা দিতে চাইল হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বা ধর্মহীন কেউ। নেবেন? একইভাবে অমুসলিমদের ধর্মীয় বা সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে আপনি কি যোগ দিতে পারবেন? পারবে সাড়া দিতে আপনার উৎসব-অনুষ্ঠানের দাওয়াতে তারাও? পারলে, বৈধ হলে, কেন বৈধ? না পারলে, অবৈধ হলে, কেন অবৈধ? দলিল কী?

এ বিষয়ে বাংলাভাষায় কোনো বই নেই, অন্তত আমাদের চোখে পড়েনি; কিন্তু থাকা উচিত। কারণ, মানবজীবনে এমন কোনো সমস্যা নেই, যে ব্যাপারে ইসলাম কিছুই বলে না। এ শূন্যতা পূরণ করতেই কালান্তরের এ বই—*অমুসলিম দেশে মুসলমান : জীবনযাপন, সমস্যা ও শরয়ি সমাধান*। উর্দু মূল বইয়ের পুরো নাম হলো—*গায়র*

মুসলিম মুলকোঁ মে আবাদ মুসলমানোঁ কে মাসায়িল আওর উন কা শরয়ী হল। বইটি বিষয়ে যেমন নতুন, বক্তব্যে তেমনি প্রামাণ্য। প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত ও অভিমতের পক্ষে কুরআন-হাদিসের দলিল এবং মুজতাহিদ আলিমদের সত্যায়ন জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

বইটি অনুবাদ করেছেন আবদুল্লাহ আনওয়ারী। বানান সমন্বয় ও সম্পাদনার প্রাথমিক কাজ করেছেন ইলিয়াস মশহুদ ও মুতিউল মুরসালিন। চূড়ান্ত সম্পাদনা করেছেন আবদুল হক। পাঠকের দৃষ্টিতে পড়েছেন আলমগীর হুসাইন মানিক। আমি নিজেও আদ্যন্ত পড়েছি।

পাঠকের কাছে আমাদের আরজ—বিধিগত, ভাষাগত বা মুদ্রণজনিত কোনো ত্রুটি চোখে পড়লে দয়া করে জানাবেন, যেন পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা শুধরে নিতে পারি। বইটির লেখক, অনুবাদক, সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতি

মাওলানা মুহাম্মাদ জফিরুদ্দিনের

দুআ ও বাণী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

ইসলামের দাবি হলো, মুসলিমরা সারা জীবন স্বাধীনভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর অনুসরণে জীবনযাপন করবেন। কিন্তু পরিবেশ ও প্রতিবেশ সবসময় সেই সুযোগ দেয় না। বিশেষত যেসব মুসলমান নানা অনুসলিম দেশে বসবাস করেন, তাঁরা নিজেদের ধর্মপালনে প্রায়শই বিভিন্ন জটিলতার মুখোমুখি হন। কখনো কখনো এসব জটিলতা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় থাকে না। তখন তাঁরা নিজেদেরকে বড় অসহায় ও বিপন্ন মনে করেন। এমন সঙ্কটে ইসলাম কী করতে বলে? একই সঙ্গে গুনাহ ও অপরাধবোধ থেকে বাঁচার কি কোনো পথ আছে?

ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, কাজেই এ বিষয়েও তার নির্দেশনা থাকা উচিত এবং তা আছেও। কিন্তু এ নিয়ে কোনো বইপত্র চোখে পড়ছিল না। আমি নিজে এর অভাব বোধ করছিলাম দীর্ঘদিন ধরে। অবশেষে আমার স্নেহভাজন মুফতি আখতার ইমাম আদিল এ শূন্যতা পূরণে এগিয়ে এলেন। কুরআন-সুন্নাহর দলিল ও ইসলামের ইতিহাসের নজির জড়ো করে লিখে ফেললেন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণ্য এ বই—*গায়র মুসলিম মুলকোঁ মে আবাদ মুসলমানোঁ কে মাসায়িল আওর উন কা শরয়ী হল*। আমার আশা পূরণ হলো। মহান আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

বইটি আমি আগাগোড়া খুব মন দিয়ে পড়েছি। লেখক প্রথমে সামনে রেখেছেন নববি যুগে মুসলিমদের তিনটি অধ্যায়—মক্কিজীবন, হাবশার অবস্থানকাল এবং মাদানিজীবন। মক্কিজীবনে মুসলমানরা ছিলেন পরাধীন। লুকিয়ে ইবাদত করতেন। অহরহ শিকার হতেন মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতনের। হাবশা ছিল একটি খ্রিষ্টান রাজ্য। রাজনৈতিক আশ্রয় পেলেও মক্কার মুশরিকরা সেখানেও তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। সবশেষে এল স্বাধীনতার অধ্যায়, মদিনায় হিজরতের পরে। সেখানে মুসলমানরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন এবং নিজেদের মতো করে দীন পালনের সুযোগ

পেয়েছিলেন। কিন্তু এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁদেরকে ১০ বছরে ৭৪ বার যুদ্ধে জড়াতে হয়েছিল এবং মদিনার ইয়াহুদি বাসিন্দাদের সঙ্গে সহাবস্থান ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করতে হয়েছিল। লেখক এই তিনটি অধ্যায়ের ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করেছেন এবং তা থেকে অমুসলিমদের সঙ্গে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু হিসেবে বসবাসের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনাবলি নিরূপণ করেছেন।

তারপর প্রসঙ্গত আলোচনা করেছেন অমুসলিম প্রতিবেশে মুসলিমদের বসবাসের আরও নানা সমকালীন জিজ্ঞাসা নিয়ে। যেমন গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রগঠন ও ক্ষমতার পালাবদলকে ইসলাম কীভাবে দেখে, এমন নির্বাচনে মুসলিমদের অংশগ্রহণ করা উচিত কি না, ছোট মুসলিম রাজনৈতিক দলের পক্ষে বড় অমুসলিম দলের সঙ্গে কিংবা এর বিপরীত অবস্থায় অমুসলিমদের সঙ্গে জোটবদ্ধ বা চুক্তিবদ্ধ হওয়া বৈধ কি না এবং কী কী শর্ত বা লক্ষণীয় দিক আছে ইত্যাদি।

সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, লেখক যা কিছুই লিখেছেন দলিল-প্রমাণ দিয়ে লিখেছেন। কাজেই বইটি আমাদের প্রবাসী ভাইবোনদের যে পথ দেখাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অধিকন্তু আমার ধারণা সাধারণ মুসলমান তো বটেই, আলিমরাও এ বই থেকে উপকৃত হবেন। বর্তমানে এ বিষয়ে জানাশোনা থাকা খুবই জরুরি।

আমি দুআ করি মহান আল্লাহ বইটিকে লেখকের জন্য আখিরাতের পুঁজি হিসেবে কবুল করুন এবং মুসলিমদের জন্য একে পথের দিশারি বানিয়ে দিন।

দুআপ্রার্থী
মুহাম্মদ জফিরুদ্দিন
মুফতি, দারুল উলুম দেওবন্দ
২৭ শাবান ১৪২৪

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১২

প্রথম অধ্যায়

অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিমদের বসবাস ও ভ্রমণের বিধান # ১৪

এক : ইসলাম এক যুগোপযোগী জীবনব্যবস্থা ১৪
দুই : নবিজীবনের তিন যুগ ১৫
তিন : আমাদের ফিকহের পুঁজি ১৭
চার : অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান ও বসবাসের বিধান ১৮
পাঁচ : অমুসলিম দেশে বসবাসের কারণ ২৯
ছয় : অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব অর্জন ৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

গণতান্ত্রিক নির্বাচন : মাসআলা ও বিধিবিধান # ৪৯

এক : প্রার্থী হওয়ার বিধান ৪৯
দুই : গণতান্ত্রিক সংসদ এবং শরিয়তবিরোধী আইন ৫৪

তৃতীয় অধ্যায়

ভোট : শরিয়ত কী বলে # ৬২

এক : ইনসাফ ও সমতাবিধান ৬২
দুই : ভোট দেওয়ার বিধান ৬৪
তিন : প্রার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড ৬৬
চার : রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোটের বিধান ৬৮
পাঁচ : নবির যুগে অমুসলিমদের সঙ্গে রাজনৈতিক ঐক্য ৬৯

ছয় : মদিনা সনদ ৬৯
সাত : হিলফুল ফুজুল ৭১
আট : খুজাআ গোত্রের চুক্তির নবায়ন ৭২
নয় : যুদ্ধ করতে অমুসলিমদের সঙ্গে জোট ৭৩
দশ : অনৈসলামিক দলকে সহায়তা ৭৩
এগারো : হাবশায় জুবায়েরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৭৪
বারো : হাবশার ঘটনা দিয়ে দলিল দেওয়ার যৌক্তিক দিক ৭৫
তেরো : পারস্য ও রোমের যুদ্ধে মুসলিমদের কর্মপন্থা ৭৭
চৌদ্দ : আহজাবযুদ্ধের একটি ঘটনা ৭৮
পনেরো : ইউসুফি সুন্নাত ৮০

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম ও অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্ক # ৮২

এক : সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি ইসলামবিরোধী ৮২
দুই : মুসলিম-অমুসলিমের সহাবস্থানের বিধান ৮৮
তিন : অমুসলিমদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের মাপকাঠি ৮৯
চার : অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুসলিম কসাইয়ের সেবা নেওয়া ৯২
পাঁচ : অমুসলিমদের সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ ৯৩
ছয় : অমুসলিমদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ৯৪
সাত : অমুসলিমদের উপহার আদান-প্রদানের বিধান ৯৭
আট : অমুসলিমদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ৯৯
নয় : অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবের উপহার পাঠানো ১০০
দশ : অমুসলিমদের উৎসবে উপহার দেওয়া ১০২
এগারো : অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ১০২
বারো : ইসলামি অনুষ্ঠানে অমুসলিমদের অংশগ্রহণ ১০৫
তেরো : অমুসলিমদের ইবাদতখানা নির্মাণ ও নকশা করা ১০৬
চৌদ্দ : অমুসলিমদের থেকে চাঁদা নেওয়া ১০৬
পনেরো : পতাকার সম্মানে মাথা নোয়ানো ১০৭
ষোলো : বন্দে মাতরম বা এমন সংগীত পরিবেশনের বিধান ১১২
সতেরো : পারস্পরিক বিবাদে অনৈসলামিক আদালতের ফায়সালা ১১৩

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামে সাংস্কৃতিক ঐক্যের বিধান # ১১৬

এক : ইসলামে সাংস্কৃতিক ঐক্যের কোনো অবকাশ নেই ১১৬
দুই : নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণের নাম ইসলাম ১১৭

পঞ্চম অধ্যায়

অমুসলিমদের স্থানীয় যুদ্ধে মুসলিমদের কর্মপন্থা # ১২০

এক : অমুসলিমদের বিবাদের ক্ষেত্রে মুসলিমদের করণীয় ১২০
দুই : দুরবস্থায় থাকা অমুসলিমদের সহায়তা ১২২

পরিশিষ্ট

উত্তম লক্ষ্য # ১২৫

ভূমিকা

আজকাল নানা কারণে প্রতিনিয়ত দুনিয়ার মুসলিম দেশগুলোর বহু মুসলমান নাগরিক বিভিন্ন অমুসলিম দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন এবং সেখানে থিতু হয়ে যাচ্ছেন। ভাবসাব দেখে মনে হয় ওসব দেশে তাঁরা বেশ সুখেই আছেন। নিজেদের অবস্থা ও জীবনযাত্রার ওপর তাঁরা সন্তুষ্ট। কেননা যাঁরা একবার যান, তাঁদের মধ্যে নিজেদের দেশে ফেরার ইচ্ছে খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু চিন্তার কথা হলো, অমুসলিম দেশের অনৈসলামিক পরিবেশে কীভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেন তাঁরা? ইসলাম একে কীভাবে দেখে? নিজেদের ঈমান রক্ষা ও দীন পালনে তাঁদের কী ধরণের জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়? এসব জটিলতা কাটিয়ে ওঠার উপায় কী? ইসলামি জীবনদর্শনের আলোকে এ নিয়ে গবেষণা করা সময়ের দাবি। আশার কথা যে, কাজটা শুরু হয়েছে। অমুসলিম দেশে সংখ্যালঘু মুসলিমদের জীবনযাপনের নীতিমালাসংক্রান্ত সমস্যা ও জিজ্ঞাসার দীর্ঘ ফিরিস্তি তৈরি করা হয়েছে এবং আমাদের প্রবীণ আলিমরা এসব ব্যাপারে শরিয়তের নির্দেশনা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিরূপণ ও উপস্থাপনে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন।

সম্প্রতি ভারতের ইসলামিক ফিকহ একাডেমি এ সংক্রান্ত একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে আলিমসমাজকে এ নিয়ে চিন্তা-গবেষণার আহ্বান জানায়। এটা দেখে আমি নিজের মন থেকে একটা তাগিদ বোধ করি। আমার মনে হতে থাকে যে, চেষ্টা করলে কিছুটা কাজ আমিও করতে পারি। এমন ভাবনা থেকেই আমি নিজের মতো করে একটি সূচি তৈরি করি এবং সে অনুযায়ী অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান শুরু করি। সেই সঙ্গে আমার অধ্যয়ন ও চিন্তাভাবনার ফলাফল একটি খাতায় টুকে রাখতে থাকি। শিক্ষকতা, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং দীর্ঘ কিছু সফরের কারণে বার বার আমার কাজে ছেদ পড়েছে বটে, কিন্তু কাজটা কখনো একেবারে বন্ধ করিনি। উলটো বরং বিদেশ সফর আমার গবেষণায় নানা নতুন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ যোগ করেছে। এই করতে করতে একসময় দেখি আমার চিন্তা ও অধ্যয়নের নোটগুলো দশাসই একটা প্রবন্ধে রূপ নিয়েছে। কয়েকটি কাগজে এর কিছু কিছু ছাপাও হতে লাগল। সেই লেখাজোখা পড়ে আলিমসমাজ বেশ

প্রশংসা করলেন এবং একে পরিবর্ধিত করে বই আকারে ছেপে বের করতে অনুরোধ জানালেন। শেষমেশ তা-ই ঘটল। হয়ে গেল বই, যা এখন আপনার হাতে।

কিন্তু নিবেদন এই যে, এটা কোনো চূড়ান্ত ফাতওয়া নয়। বলা চলে একজন অনুসন্ধিৎসু তালিবুল ইলমের কড়চা। তবু প্রবাসী মুসলিম ভাইবোনেরা এ থেকে কিছু আলো পাবেন বলেই আমি আশা করি। শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের ভার রইল আমাদের বিজ্ঞ আলিমদের ওপর। কোনো ত্রুটি বা অপূর্ণতা গোচরে এলে দয়া করে আমাকে জানাবেন, আরজ রইল।

বন্ধুদের মধ্য থেকে যাঁরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, সকলের প্রতি শুকরিয়া। বিশেষ কৃতজ্ঞতা ইউনিভার্সাল পিস ফাউন্ডেশনের আবদুর রব কারিমি, মাওলানা সায়াদ উল্লাহ কাসিমি এবং প্রিয় ভাই মাওলানা মাহবুব ফুরুগ আহমাদ কাসিমির প্রতি, যাঁদের নিষ্ঠা ও শ্রমে এ প্রকাশনা সম্ভব হলো। আল্লাহ তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

এ ছাড়াও দারুল উলুম দেওবন্দের শ্রদ্ধাভাজন উসতাজ মুফতি মাওলানা জফির উদ্দিনের প্রতি শুকরিয়া, যাঁর স্নেহদৃষ্টি আমার তাখাসসুস বিভাগে উচ্চতর পড়ালেখায় সহায়ক হয়েছিল। তিনি এ বইটি পড়ে নিজের মতামত পেশ করে আমাকে পুনশ্চ ঋণী করেছেন। জামিয়া রাব্বানিয়ার দায়িত্বশীলদেরও ধন্যবাদ, যাঁরা গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সময়োপযোগী এ মাসআলাটির গুরুত্ব অনুভব করে তাঁরা তা প্রকাশ করেছেন। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং দীনি খিদমতের জন্য আমাদেরকে কবুল করুন।

মুফতি আখতার ইমাম আদিল কাসিমি
মুহতামিম, জামিয়া রাব্বানিয়া মনরওয়া, বিহার, ভারত
৭ জিলহজ ১৪২৪

প্রথম অধ্যায়

অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিমদের বসবাস ও ভ্রমণের বিধান

এক. ইসলাম এক যুগোপযোগী জীবনব্যবস্থা

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা। কুরআন-হাদিস ও নবিচরিতের মাধ্যমে ইসলাম যে আদর্শ ও শিক্ষা মানবজাতির সামনে পেশ করেছে, তা সব যুগের সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয়। তার সকল যুগের উপযোগিতা আমাদের কাছে কিছুটা বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি দাবি করে।

কুরআনুল কারিম প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প অল্প করে নাজিল হয়েছে। নবিজীবনের শিক্ষা এবং নীতিমালাও এসেছে পর্যায়ক্রমে। ইসলাম ও মুসলিমদের জীবনে ইসলামের বিধানাবলির এ পর্যায়ক্রমিক অন্তর্ভুক্তির পেছনে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিশেষ দখল ছিল। যদি তার পূর্ণ নীতিমালা ও পবিত্র সিরাতের সব শিক্ষা একসঙ্গে এসে যেত, তাহলে হয়তো বাস্তবে একই সময়ে একসঙ্গে তার সার্বিক প্রয়োগ সম্ভব হতো না। পর্যায়ক্রমিকতার ফলে নীতিমালাগুলো অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতে পেরেছে। এদিকে মুসলিমদেরও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁরা ইসলামের নীতিমালার আলোকে নিজেদের অবস্থা ও অবস্থানে অবিচল থাকেন। সেই সঙ্গে ইসলামি আদর্শ ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রচারকার্যও যেন তাঁরা চালু রাখেন।

সাধারণভাবে লক্ষ করা যায়, ইসলামের প্রথম যুগের অনেক বিধান পরবর্তী যুগে অবতীর্ণ বিধানের মাধ্যমে রহিত হয়ে গিয়েছে, সঙ্গত কারণেই তা হয়েছে। এভাবে আগের বিধানকে পরের বিধান রহিত করে দিতে পারে।

এই ব্যাপারটি ইবাদত, ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলি এবং মুসলিমদের পারস্পরিক আচার-ব্যবহার সম্পর্কে প্রযোজ্য হলেও মুসলিমজীবনের বহিরাগত বিষয় এবং অমুসলিমদের সঙ্গে মুসলিমদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে

প্রযোজ্য বলে গণ্য করা সমীচীন নয়। ইসলামি বিধান বা নবিজীবনের পবিত্র কর্মনীতির নমুনার মধ্যে যেটুকু তারতম্য দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তাতে রহিত হওয়ার চেয়ে অবস্থার পরিবর্তনের কারণে বিধানের পরিবর্তনই বেশি চোখে পড়ে। আর অবস্থা পরিবর্তনের কারণে যে বিধান পরিবর্তিত হয় সেটা রহিতকরণ নয়, বরং সামঞ্জস্যবিধান। একজন ফকিহ অর্থাৎ শরিয়তের নীতিমালায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো তিনি এ গবেষণা করবেন যে, ইসলামের কোন বিধান কোন ধরণের অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

বর্তমানে খাইরুল কুরুনের (অনুসরণীয় সর্বোত্তম যুগ) মতো মুজতাহিদ গড়ে উঠবেন না বটে—কিন্তু ওই স্তরের বৈশিষ্ট্য ও বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি তো অবশ্যই তৈরি হবেন, যাঁর মাধ্যমে মানুষ বিধানাবলির স্তর বুঝতে এবং প্রত্যেক বিধানকে যথাস্থানে মূল্যায়ন করতে পারবে।

দুই. নবিজীবনের তিন যুগ

মুসলিমদের বহিরাগত বিষয়-আশয় এবং অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে আমাদের সামনে নবিজীবনেই রয়েছে ইসলামি যুগের তিনটি নমুনা :

১. মক্কিযুগ,

২. হাবশায় মুসলিমদের অবস্থানের যুগ,

৩. মাদানিযুগ।

প্রত্যেক যুগের মুসলিমদের জন্য মাসআলা-মাসায়িলের ক্ষেত্রে এ তিনটি যুগ মৌলিক দিকনির্দেশনা দেবে। এ তিন যুগ মূলত মুসলিমদের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের তিনটি আদর্শ বা নমুনা।

১. মক্কিযুগ : এটা ছিল মুসলিমদের পরাধীনতার কাল। অর্থাৎ এমন পরিবেশ, যাতে মুসলিমদের রাজনৈতিক অবস্থান ছিল অমুসলিমদের তুলনায় দুর্বল। তখন মুসলিমরা একটি দুর্বল ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে অমুসলিমদের প্রভাব ও সংখ্যাধিক্যের মধ্যে বসবাস করতেন। এই সময়টায় ইসলামি বিধানের ওপর স্বাধীনভাবে আমলের অবকাশ যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না কোনো প্রকারের জাতীয় বা ধর্মীয় আইন বাস্তবায়নের সুযোগ।

২. হাবশার যুগ : এই কালপর্বটা মুসলিমদের অংশত স্বাধীন অবস্থার কাল। অর্থাৎ এমন পরিবেশ, যাতে মুসলিমরা রাজনৈতিক ও জাতীয়ভাবে সংখ্যালঘু হলেও ধর্মীয়ভাবে ছিলেন স্বাধীন। তখন মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিমদের মধ্যে সম্মানিত

একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে বসবাস করছিলেন। সেখানে তাঁদের জন্য নিজেদের রাজনৈতিক ও জাতীয় সুবিধালাভের সুযোগ ছিল। তখন হাবশায় ছিল নাজাশির শাসন।

এ ধরণের পরিবেশে আমজনতার পক্ষে রাজ্য পরিচালনা বিষয়ে প্রভাব খাটানো বা মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকে না, কিন্তু নিজেদের দলীয় ও রাজনৈতিক ইচ্ছা পেশ করার অনুমতি থাকে। মুসলিমরা তখন এরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যা হাবশায় অবস্থানকালে এক যুদ্ধের সময় মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসেবে জুবায়ের রা.-এর দলীয় সেবায় অংশগ্রহণ করা থেকে অনুমিত হয়।[১]

৩. **মাদানিযুগ :** এ যুগ মুসলিমদের বিজয়ের যুগ। এ যুগের দুটি পর্যায় রয়েছে : প্রথম পর্যায়টি হলো, মুসলিমদের রাজনৈতিক শক্তি সংগ্রহ ও ক্ষমতার ভিত নির্মাণের সময়। তখন মুসলিমরা সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও অন্য এক অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইয়াহুদিদের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক চুক্তি করতে হয়েছে, যাতে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে মুসলিমরা তাদের থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন এবং নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার কাজে ব্যস্ত থাকতে পারেন। এভাবে রাতারাতি মুসলিমরা একটি একক ও সংঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হন। সুতরাং বলা যায়, মাদানিযুগের প্রথম দিকে যে পরিবেশ ছিল, তখন উম্মতকে শক্তি সংগ্রহের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ইয়াহুদিরাও তখন গুরুত্বপূর্ণ একটা অবস্থানে ছিল। তাই তাদের প্রতি তখন লক্ষ রাখা হতো এবং মুসলিমরা নিজেদের প্রতিরক্ষা ও বহিরাগত সমস্যাবলির ক্ষেত্রে অমুসলিমদের কার্যকলাপের সম্পৃক্তিকে যথাসম্ভব গুরুত্ব দিতেন। এ ধারাবাহিকতা কয়েক বছর চলমান ছিল। মুসলিমরা নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, দাওয়াতি প্রচেষ্টা ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে থাকেন।

এরপর শুরু হয় মাদানিজীবনের শেষ পর্যায়, যা মুসলিমদের নিরঙ্কুশ বিজয় ও নিরাপত্তার যুগ। তখন সংখ্যালঘু অমুসলিমরা দুর্বল ও অনুগত একটি জাতিগোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করতে থাকে। ধর্মীয় ও আর্থিক দিক দিয়ে স্বাধীনতা ভোগ করা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা মুসলিমদের ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারেনি। এ অবস্থা নবিজীবনের শেষ সময় পর্যন্ত ছিল। তখন ভৌগোলিকভাবে মদিনার পরিধি বাড়তে শুরু করে। এমনকি আরবের বেশিভাগ এলাকা নবিজির জীবৎকালেই ইসলামি শাসনের আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্কের সীমা চারিত্রিক ও সামাজিকভাবে পূর্ণতা পায়। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে বাইরের শত্রু থেকে আত্মরক্ষার ওপর তখনো সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম* : ১/৩৬১।

নবির যুগের পরবর্তী খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে বিজয়ের এই অভিযাত্রা আরও বিস্তৃত হতে থাকে। মুসলিমজাতি অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়। এক শতাব্দী ধরে তাঁরা বিজয়ী শক্তি হিসেবে তখনকার রাষ্ট্র ও জাতিগুলোর ওপর কর্তৃত্ব চালান।

তিন. আমাদের ফিকহের পুঁজি

ফিকহ বা ইসলামি আইনশাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডারের বড় একটি অংশ উল্লিখিত বিজয়যুগেরই কীর্তি। সে সময় আলিম ও ফকিহরা মুসলিমদের বিজয়ী একটি জাতি ধরে নিয়ে অমুসলিমদের সঙ্গে তাদের মেলামেশাসংক্রান্ত মাসআলা ও আচরণনীতি নিয়ে কাজ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে তখন যে অবস্থা তাঁদের সামনে ছিল এবং মুসলিম-অমুসলিমদের মধ্যকার সম্পর্কের যেসব ধরণ তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, ফকিহরা সে অনুযায়ী বিধানাবলি নির্ণয় করেছেন। এজন্য আমাদের ফিকহে সিয়ার, জিহাদ, সন্ধি, ব্যাবসা-বাণিজ্য ও বৈধাবৈধতার অধ্যায়গুলোতে যেসব মাসআলা-মাসায়িল রয়েছে, সেগুলোতে ওই বিজয়ী সময়ের প্রতিফলনই দেখা যায়। তাই ইমাম মালিক রাহ.-এর *আল-মুদাউওয়ানা*, ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর *কিতাবুল খারাজ*, ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর *জাহিরুর রিওয়ায়াত*, ইমাম শাফিয়ি রাহ.-এর *কিতাবুল উম্ম* থেকে *আলমাগিরি*, *শামি* এবং *মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়া* পর্যন্ত সকল ফিকহি গ্রন্থে অমুসলিমদের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্ক বিষয়ের ওপর মোটামুটি একই ধরণের আলোচনা দেখা যায়। আজকের দিনে আমরা কী করে ভাবতে পারি যে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে এবং মুসলিমরা আবার মদিনার প্রথম যুগে বা হাবশা ও মক্কার যুগে ফিরে যাবেন! অবশ্য হাদিসে আগের অবস্থায় ফেরার ইঙ্গিত রয়েছে :

إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا

> ইসলাম এসেছে অপরিচিত হিসেবে, তারপর আবার সে তার শুরুর অবস্থার দিকে ফিরে যাবে।[৭]

১. একটি মৌলিক পার্থক্য

কুরআন-হাদিসের মৌলিক নীতিমালা এবং ফিকহের 'ইজতিহাদি' (গবেষণাপ্রসূত) নীতিমালায় এটাই পার্থক্য যে, কুরআন-হাদিসের মৌলিক নীতিমালার মধ্যে মানবজীবনের সকল স্তর ও যুগের দিকে প্রথম থেকেই লক্ষ রাখা হয়েছে। আর এটিই

[৭] *সহিহ মুসলিম* : ১৪৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৯৮৬; *তাবারানি* : ৬১৪৭।

তার সকল যুগের উপযোগী হওয়ার মূল রহস্য। এর বিপরীতে প্রত্যেক যুগের ফিকহি ইজতিহাদ স্থান-কাল-পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অবশ্য কুরআন-হাদিসের বুনিয়াদি নীতিমালায় কোনো যুগেই কোনোরকম পরিবর্তন হওয়ার নয়। ফকিহরা কেবল নিজেদের যুগের অবস্থা ও ঘটনাবলির সঙ্গে সম্পৃক্ত মাসআলার সমাধান উদ্‌ঘাটনে নিয়োজিত থাকেন। যদি প্রত্যেক অবস্থায় তাদের দায় মেনে নেওয়াও হয়, তবু সাধারণভাবে নিজেদের স্থান-কাল-পাত্রের আয়নায় যা তাঁদের দৃষ্টিগোচর হবে, তাঁরা তাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর কালোত্তর ফিকহ[৩] এই অর্থে একটি বিরাট বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর এই কালোত্তর ফিকহকে বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লোক তৈরি হয়নি। তাই ফকিহরা প্রধানত নিজেদের যুগের অবস্থা ও মাসআলার ওপরই তাঁদের প্রয়াস নিবদ্ধ রেখেছেন। অর্থাৎ, যে-মাসআলার প্রয়োজন ছিল এবং যে-মাসআলা মীমাংসার জন্য তাঁরা দায়বদ্ধ ছিলেন, কেবল সেগুলো নিয়েই তাঁরা গবেষণা করেছেন।

২. সংখ্যালঘু ফিকহের ভিত্তি

বর্তমান যুগ হলো উম্মাহর রাজনৈতিক অবনতির যুগ। এ যুগে দেশে দেশে মুসলিমরা শুধু রাষ্ট্রপরিচালনার শক্তিসামর্থ্য থেকেই বঞ্চিত নন, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নিজেদের রাষ্ট্র বা অন্যান্য জাতির ওপর প্রভাব খাটানোর সাধ্যও তাদের নেই। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে উম্মাহর অবস্থা নবির যুগের উল্লিখিত তিন উদাহরণের মধ্য থেকে কোনো একটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কাজেই এ তিনটির যেকোনো একটিকে আমরা আমাদের মাইলফলক বলে ধরতে পারি। আমাদের ফিকহের মৌলিক নীতিমালা এ ব্যাপারে এখনো বলতে গেলে নীরবই। তবু, সেসব মৌলিক নীতিমালায় বর্তমান পরিস্থিতির দিকে কিছুটা ইঙ্গিত তো নিশ্চয়ই রয়েছে। আর সালাফ তথা পূর্ববর্তীদের ইঙ্গিতও খালাফ তথা পরবর্তীদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবিদার। এজন্য সংখ্যালঘুবিষয়ক 'ফিকহ' সম্পর্কে গবেষক আলিমদের কর্তব্য হবে এসব ইঙ্গিতকেও অন্ধকারে আলোকবর্তিকা হিসেবে নিজেদের সামনে রাখা।

চার. অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান ও বসবাসের বিধান

পৃথিবীতে বহু মুসলমান বিভিন্ন অমুসলিম দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে বসবাস করছেন। বর্তমানে কেবল ভারতেই মুসলিমদের সংখ্যা ২০ কোটির ওপরে। অর্থাৎ,

[৩] ভবিষ্যতে যেসব সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, সেসব ঘটার আগেই ইমাম আবু হানিফা রাহ. সমাধান বের করে রাখতেন। 'কালোত্তর ফিকহ' বলে তা-ই বোঝানো হয়েছে।

ভারত হলো সর্বোচ্চসংখ্যক মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এছাড়াও চীনে ১৫ কোটি, রাশিয়ায় ১ কোটি ৪০ লাখ, ইউরোপে ১ কোটি ৮০ লাখ এবং আমেরিকায় ৮০ লাখ মুসলিম বসবাস করছেন। এভাবে আফ্রিকার দেশসমূহেও বাস করছেন কোটি কোটি মুসলমান। তানজানিয়া, উগান্ডা, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং এশিয়ার দেশসমূহ—যেমন সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ইত্যাদিতেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মুসলমান বাস করছেন।

অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিমদের বসবাসের মাসাআলায় শরয়ি প্রথম প্রশ্ন হলো, সেখানে অবস্থান ও বসবাস সম্পর্কে শরিয়ত কী বলে, মুসলিম দেশ ছেড়ে অমুসলিম দেশে গিয়ে স্থায়ীভাবে থাকা এবং সেখানকার আইনের প্রতি আনুগত্য দেখানো কি জায়িজ?

এ মাসআলার শরয়ি বিধান জানতে দুটি ভিত্তির ওপর চোখ রাখা আবশ্যক :

১. যে-অমুসলিম দেশে কোনো মুসলিম থাকছেন বা থাকতে চান, তাঁর জন্য সেখানকার আইনি ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল কেমন হবে। অবস্থার পার্থক্যের কারণে বিধানেও পার্থক্য ঘটবে।

২. সেখানে বসবাসের কারণ কী। কারণের পার্থক্যের জন্য বিধানও ভিন্ন হবে।

১. অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রকার

ফকিহরা অমুসলিম দেশগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করে এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা বিধান বর্ণনা করেছেন। ফিকহের গ্রন্থাদিতে এ সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। আমরা এখানে এ তিনটি ভাগের আওতায় আসা মাসআলাগুলোর সারাংশ তুলে ধরব :

ক. এমন অমুসলিম রাষ্ট্র, যেখানে মুসলিমদের পক্ষে বাস করা খুবই কঠিন, যেখানে একজন মুসলমানের নিজের এবং তার পরিবার-পরিজনের দীন, ঈমান, জান-মাল ও সম্মানের নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই, যেখানকার পরিবেশ হিজরত-পূর্বকার মক্কিজীবনের মতোই ইসলামবিরুদ্ধ।

এমন দেশে যাওয়া বা সেখানে বাস করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িজ। যে সেখানে আগে থেকে বাস করছে, কোনো মুসলিম বা নিরাপদ দেশে হিজরত করার সুযোগ থাকলে তার অবশ্যই তা করা উচিত।[৪]

তবে ইমাম শাফিয়ি রাহ. এ বিধান থেকে এমন মুসলিমদের বাইরে রেখেছেন, যারা সেখানে থাকলে মুসলিমদের কোনো উপকার হবে। ব্যক্তিগতভাবে যারা ঈমানের

[৪] *মুগনিল মুহতাজ*, শিরবিনি : ৬/৫৪; *আল-উম্ম*, ইমাম শাফিয়ি : ২/১৬৯; *আল-হাবিল কাবির*, মাওয়ারদি : ১৮/৩১১; *রাওজাতুত তালিবিন*, আল্লামা নববি : ৭/৪৭৪।